সন্তান গড়ার কৌশল

সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার করণীয়

মূল

জামিলা হো

অনুবাদ

নিশাত তামমিম

মেহজাবীন ইসলাম মীম

সম্পাদনা

ডা. শামসুল আরেফীন

সত্যায়ন

প্রকাশন

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

সন্তান গড়ার কৌশল

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-78-9

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২০

উৎস-নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৫০ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম পর্ব : সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ

প্রথম অধ্যায় : সন্তানদের ইতিবাচক আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করা ১২

১. দেহভঙ্গি (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) ও মুখভঙ্গি (এক্সপ্রেশান) ১২
২. উৎসাহদায়ক শব্দচয়ন ১৪
৩. ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ১৫
৪. মনোযোগ দিয়ে শোনা ১৭
৫. সহমর্মিতা ১৯
৬. নীতিমালা প্রতিষ্ঠা ২০
ক) নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করা ২১
খ) নীতিমালা প্রয়োগ করা ২২
গ) নিয়ম স্মরণ করিয়ে দেওয়া ২৩
৭. অনুশীলন ২৩
৮. আগে জানিয়ে রাখা ২৪
৯. ইতিবাচক পরিণাম ২৫
১০. বেছে নেওয়ার সুযোগ ২৬
১১. সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ২৭
ক) এলার্ম বাজানো ২৭
খ) কাউন্ট আপ/ কাউন্ট ডাউন ২৮
১২. চার্ট প্রণয়ন ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : নেতিবাচক আচরণে অনুৎসাহিত করা ৩২
১. ধমক ৩২
২. সংশোধনী বার্তা ৩৩
৩. সতর্কবার্তা ৩৪
৪. নেতিবাচক পরিণাম (শাস্তি) : মনোযোগ সরিয়ে নেয়া ৩৫
৫. শাস্তি : সুবিধা লাঘব করা ৩৫
৬. শাস্তি : টাইম-আউট ৩৬
ক) বাচ্চাদের জন্য টাইম-আউট ৩৬
খ) বাবা-মা'দের জন্য টাইম-আউট ৩৭
৭. শাস্তি : গায়ে হাত তোলা ৩৮

দ্বিতীয় পর্ব : সন্তানের সাথে যোগাযোগ

শুরুর কথা ৪১

১. অমৌখিক যোগাযোগ ৪৩
ক) শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ৪৩
খ) স্পর্শ ৪৫
গ) প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ ৪৭
ঘ) আচরণ শিক্ষা ৪৯
ঙ) অনুমোদন দেবার ক্ষেত্রে সাবধানতা ৫১

২. মৌখিক যোগাযোগ (ভার্বাল কমিউনিকেশন) ৫৩
ক) কথা বলার সময় করে নেওয়া ৫৩
খ) প্রশংসা অভিব্যক্ত করা ৫৫
গ) উৎসাহিত করা ৫৬
ঘ) ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ৫৮
ঙ) ইতিবাচক বাচনভঙ্গি ৬০
চ) আদেশকে বিবৃতিতে পরিবর্তন করুন ৬২
ছ) নেতিবাচক কথা থেকে বিরত থাকা ৬৩

জ) সংশোধনী প্রতিক্রিয়া ৬৬
ঝ) বন্ধন ও কথোপকথন ৬৭

৩. বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ ৬৯
ক) ভালোবাসার চিরকুট ৭০
খ) মেসেজিং ৭১
গ) ইমেইল ৭২
ঘ) কার্ড ও চিঠিপত্র ৭৩

৪. যোগাযোগ দক্ষতা ৭৪
ক) সচেতনভাবে শোনা ৭৫
খ) সহমর্মিতা ৭৮
গ) একাগ্রতা ৮০
ঘ) আবেগ প্রশিক্ষণ ৮২

তৃতীয় পর্ব : সন্তানের সাথে মেলবন্ধন

১. একসাথে সময় কাটান ৮৬
ক) সময় নির্ধারণ করুন ৮৭
খ) কাজ নির্ধারণ করুন ৮৭

২. ইতিবাচক কথা বলুন ও মনোযোগ দিয়ে শুনুন ৮৯
ক) আলাপচারিতার সময় বের করুন ৮৯
খ) আলাপচারিতার ধরন উন্নত করুন ৯১
- উৎসাহদায়ক শব্দচয়ন ৯১
- ইতিবাচক ভঙ্গিতে ৯১
- দ্বিমুখী সংলাপ ৯২

৩. উৎসাহ ও সমর্থন দিন **৯৪**
ক) ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ৯৫
খ) সংশোধনবার্তা ৯৬

ভূমিকা

মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্যারেন্টিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—সন্তানদেরকে সৎকর্মশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা। যাদের আচরণ হবে প্রশংসনীয়, নৈতিকতা হবে সর্বোত্তম। এই ক্ষেত্রেও আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হলেন নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্র ও মাধুর্যের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে তা সত্যায়ন করে বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আপনি আছেন সর্বোত্তম চরিত্রের ওপর।"[১]

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম (অবয়ব ও আচরণে), সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ও অসীম-সাহসী ব্যক্তিত্ব।'[২]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পুরো জীবনে কখনও কাউকে অশ্লীল কথা বলেননি এবং গালমন্দ করেননি। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যার আচার-ব্যবহার সর্বোত্তম।"[৩]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। মন্দ কাজ করে ফেললে তা মুছে ফেলার জন্য সাথে সাথেই একটি ভালো কাজ করো। আর মানুষের সাথে করো উত্তম আচরণ।"[৪]

---

[১] সূরা ক্বলম, ৬৮ : ০৪।
[২] বুখারি, ৬০৩৩; মুসলিম, ৩৩০৭।
[৩] বুখারি, ৬০৩৫; মুসলিম, ২৩২১।
[৪] তিরমিযি, ১৯৮৭, হাসান; আহমাদ, ২১৩৯২।

সন্তান-পালনের ক্ষেত্রে সদুপদেশ ও শাসনের নানা কৌশল বাবা-মা'দের জানাই থাকে। কিন্তু এত এত কলাকৌশলের মধ্যে কোনটি কোন বয়সে প্রয়োগ করা উচিত, তা বোঝার উপায় কী? এ নিয়ে মাঝে মাঝেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে হয়। বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের জানা এই কৌশলগুলোকে যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাবা-মা'দের কাছে তুলে ধরা। পাশাপাশি সহজভাবে তা প্রয়োগ করার জন্য প্রাসঙ্গিক ইসলামি মূলনীতিগুলো জানিয়ে দেওয়া।

সন্তান প্রতিপালনের যেসব পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা হয়তো প্যারেন্টিং-এর যে-কোনো জনপ্রিয় বইয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে এ বইটির বিশেষত্ব হলো, আলোচনা বিস্তারিত হলেও পাঠকের কাছে মোটেই বিরক্তিকর ঠেকবে না। বইটি কিছুটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত হবে ইন শা আল্লাহ।

সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ

১ম অধ্যায়

সন্তানদেরকে ইতিবাচক আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করা[৫]

সন্তানদেরকে পজিটিভ আচরণে উৎসাহ যোগাবে এবং এর ওপর অবিচল রাখবে, এমন কিছু পদ্ধতি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করা দরকার সবার আগে।

'তোমার পক্ষে অসম্ভব' এমন কথা শুনতে আমাদের সন্তানেরা খুব অপছন্দ করে। **'তোমার দ্বারা সম্ভব'** এমন কথাই তারা বেশি শুনতে চায়। আচরণ সুন্দর করার জন্য কী কী করতে হবে—বাবা-মা'রা যদি এই ব্যাপারে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আশা করা যায় পরবর্তীকালে বাচ্চারা নিজেরাই নতুন নতুন রাস্তা বের করে নিতে পারবে।

১. দেহভঙ্গি (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) ও মুখভঙ্গি (এক্সপ্রেশান)

বাবা-মা সন্তুষ্ট না বিরক্ত, বাচ্চারা তা চাহনি, মুখভঙ্গি ও বডি ল্যাংগুয়েজ দেখে অনায়াসেই বুঝে ফেলে। কোনো কাজ করার পর বাবা-মা'র সন্তুষ্ট চাহনি (যেমন, হাসিহাসি মুখ) পেলে বাচ্চারা সেই কাজটি করতে আরও উৎসাহিত হয়। এমনকি ছোটো ছোটো শিশুরাও এসব বোঝে। বাবা-মা'র মৃদু হাসি কিংবা মুচকি হাসির ফোয়ারা যেন আনন্দের ফুল ফোটায় শিশুর মনে। আর সে ফুলখানিই অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় আরও নতুন নতুন ফুল ফোটানোর ক্ষেত্রে। অন্যদিকে বিরক্তিকর চাহনি বা পাত্তাহীন মুখভঙ্গিই কিন্তু থামিয়ে দিতে পারে কাজটির স্পৃহা।

স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চারা চায় বাবা-মা'কে খুশি করতে। সরল-সুন্দর যে কাজে

[৫] অনুবাদ : নিশাত তামমিম।

বাবা-মা হেসেছে, তা শিশু মনে রাখে। এমন সরল ধাঁচের কাজ সে আরও করতে চায়। আসলে দেখুন, প্রতিটি মানুষই কিন্তু সন্তুষ্ট দেখতে চায় তার ভালোবাসার মানুষদের। কেবল এই বিষয়টিকে সযত্নে লালন করলেই সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিরা তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁরা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন। এবং তাঁরা এটাও জানতেন যে, কী করলে তিনি খুশি হন।

আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, 'আমি কা'ব ইবনু মালিককে তাঁর তাবুক যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার ঘটনাটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : 'যখন আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিই, তাঁর মুখ আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি যখন খুশি থাকতেন, তাঁর মুখ যেন চাঁদের টুকরোর মতো ঝলমল করত। আমরা তাঁর মুখ দেখেই তাঁর মনের অবস্থা আন্দাজ করে নিতাম।'[৬]

অন্যদিকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিপর্যস্ত থাকতেন, তখন কী হতো?

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করে, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুসলমানদের মধ্যে গনীমাতের মাল (অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বিতরণ করছিলেন, এক লোক বলে উঠল, 'এই বিতরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়নি।' আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে এ কথা জানালাম। এ কথা শুনে তিনি এতটা রাগান্বিত হলেন যে, আমি তাঁর মুখে সেই রাগের অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর রহম করুন। তাঁর জাতি তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছিল, তারপরেও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।" '[৭]

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে একবার অপছন্দনীয় কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি উত্তর না দিয়ে চুপ রইলেও প্রশ্নকর্তা জেরা করতেই থাকে। এতে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে সবাইকে বললেন, "তোমাদের যার যা খুশি, তাই জিজ্ঞাসা করো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা কে? তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার বাবা হুজাইফা।" তারপর

[৬] বুখারি, ৪৪১৮।

[৭] বুখারি, ৬০৫৯; মুসলিম, ১০৬২।

আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বাবা কে? তিনি উত্তর করলেন, "তোমার বাবা সালিম, শাইবার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।" অবশেষে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মুখে রাগের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।'[৮]

তাই বাচ্চা যখন ভালো কিছু করে, তখন বাবা-মা'র উচিত হাসিমুখে তাকে আলিঙ্গন করা, তাকে চুমো খাওয়া বা অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কাজটিকে অনুমোদন করা। আবার শিশু যখন ভুল কিছু করে বসে তখন ভ্রুকুঞ্চন, হাত ভাঁজ করে রাখা, কোমরে হাত দেওয়া বা এ রকম কোনো নেতিবাচক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তার কাজে অসমর্থন জানানোর চেষ্টা করা।

তবে মনে রাখতে হবে, এসব উপায় কেবল তখনই কাজে দেবে যখন বাবা-মা ও সন্তানের মাঝে স্নেহপূর্ণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে।

২. উৎসাহদায়ক শব্দচয়ন

শিশুরা কঠিন কথা, নিন্দা, অভিযোগ ইত্যাদির চেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথাবার্তায় বেশি সাড়া দিয়ে থাকে।

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে ছিলাম, এর মধ্যে তিনি একবারও উহ শব্দটিও বলেননি এবং কখনও জেরা করে বলেননি, কেন তুমি এমনটি করেছ বা কেন এটা করোনি?'[৯]

বাচ্চারা যেহেতু সব সময় বাবা-মা'কে সন্তুষ্টই করতে চায়, তাই তাদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সে যে-কোনো কিছু করতে ইচ্ছুক থাকে। এ জন্যে বলা হয় যে, বাবা-মা সন্তানের যে ভালো আচরণটি ধরে রাখতে চান, তারা যেন সেই আচরণটির প্রশংসা করেন। তবে হ্যাঁ, প্রশংসা করলে তা মন থেকেই করা চাই। কেবল ফাঁকা বুলি আওড়ানোর দরকার নেই। জগতে কোনো কিছুই মূল্যহীন নয়। সামান্য একটু করুণারও মূল্য আছে। মূল্য আছে অজান্তেই বাবা-মা'র মুখ ফসকে বের হয়ে আসা ছোট্ট কোনো প্রশংসাবাণীরও।

আমরা শুধু সেই কাজেরই প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করব, যেটা সন্তানের জন্য

---

[৮] মুসলিম, ২৩৬০।

[৯] বুখারি, ৬০৩৮; মুসলিম, ২৩০৯।

করা সহজ। অসম্ভব কোনো কিছুর দিকে তাকে উৎসাহিত করব না। বাবা-মা'র মুখের কথার সাথে দেহভঙ্গিও যেন তার সমর্থনসূচক হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সন্তানদের ব্যাপারে কঠোর আচরণের পরিবর্তে সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা বেশি জরুরি। এতে করে সন্তানরা বাবা-মা'র ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারবে।

সন্তানের উন্নতির জন্য সহায়ক কোনো উত্তম কথা যদি বাবা-মা বলতে না-ই পারেন, তা হলে অন্তত যেন চুপ থাকেন।

> আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "...যে ব্যক্তি আল্লাহ ও বিচার-দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[১০]

৩. ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া

আপনি যদি চান যে, ভালো কাজটি সন্তান বারবার করুক, তবে সেটার কেবল প্রশংসা করলেই চলবে না। কাজটির ব্যাপারে কিছু পজিটিভ কথাও বলতে হবে। কাজটি কীভাবে করা উচিত, কেন বারবার করা উচিত—এই ব্যাপারে শুধু প্রশংসাই কোনো ধারণা এনে দেয় না। বাবা-মা যদি শুধু বলেন 'ভালো ছেলে/ভালো মেয়ে', তখন শিশুটি হয়তো চিন্তায় পড়ে যাবে—কাজটি কীভাবে ভালো হলো? কেন ভালো হলো? কেনই বা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? সন্তানের এসব প্রশ্নের উত্তরই হলো সেই সব পজিটিভ কথা, যা বাবা-মায়ের বলা উচিত। এর মাধ্যমে সন্তান ইতিবাচক আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বাচ্চাকে কোনো ভালো কাজ করতে দেখলে পিতা-মাতা যা যা করতে পারেন :

- ❖ কাজটি উল্লেখ করুন।
- ❖ ভালো কাজটির কারণে অন্যরা কীভাবে উপকৃত হলো বা কাজটা অন্যকে কীভাবে সন্তুষ্ট করল, তা বুঝিয়ে বলুন।
- ❖ কাজটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করুন। প্রতিটি কাজ আল্লাহর জন্য করার শিক্ষা দিন।
- ❖ সবশেষে কাজটির প্রশংসা করুন। কাজটি অনেক ভালো, তুমি এটা বারবার করবে—এই জাতীয় কিছু বলুন।

একটি উদাহরণ খেয়াল করুন। বাচ্চাটি যখন তার খেলনা অন্য কাউকে খেলতে

[১০] বুখারি, ৬০১৮; মুসলিম, ৪৭; আবূ দাউদ, ৫১৫৪।

দিচ্ছে, তখন বাবা-মা এভাবে বলতে পারেন : 'তুমি যে ওই বাবুটাকে তোমার চায়ের কাপ নিয়ে খেলতে দিয়েছিলে, ও কত খুশি হয়েছিল জানো? তুমি যখন কাউকে এভাবে কিছু দেবে, আল্লাহ তোমার ওপর খুশি হবেন। কত্তো ভালো মেয়ে তুমি, কত্তো সুন্দর করে নিজের খেলনা শেয়ার করো সবার সাথে, মা শা আল্লাহ!'

আবার ধরুন, বাচ্চাটি তার খেলনা নিজেই গুছিয়ে রাখল। তখন বাবা-মা এভাবে বলবেন : 'সোনামণি, তুমি তোমার খেলনাগুলো গুছিয়ে রেখেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহও খুশি হন, বুঝেছ?'

অথবা শিশুকে কোনো কাজ দিলেন। সমাধা করে ফেলার পর বলুন, 'আমি যে কাজটি করতে দিয়েছিলাম, তা তুমি করে ফেলেছ! মা শা আল্লাহ। আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি যখন আমাকে খুশি করেছ, তখন আল্লাহও তোমার ওপর খুশি হয়েছেন। তুমি অনেক ভালো একটা বাবু।'

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানোর এই ধাপগুলো হুবহু এমনই হতে হবে, তা নয়। বাবা-মা এভাবেও বলতে পারেন, 'তুমি কত্তো ভালো! আমি যেভাবে বলেছি, তুমি ওভাবেই করেছ! আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আর তুমি যদি আমাকে খুশি করো, তবে আল্লাহও তোমার ওপর খুশি হবেন।'

বাহবা জানানোর সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, **ফোকাস যেন থাকে ভালো কাজটির উদ্যোগ ও ভালো আচরণের দিকে। ফলাফলের দিকে নয়।** বাবা-মা'কে এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। **জোর দিতে হবে বাচ্চার প্রচেষ্টা বা সামর্থ্যের ওপর। ফলাফলের ওপর নয়।**

শিশু হয়তো বাবা-মা'কে তার কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কিন্তু বাবা-মা'কে মনে রাখতে হবে—কৃতিত্বই আসল কথা নয়। বরং এর জন্যে শিশু যে প্রচেষ্টা করেছে, সেটাই মুখ্য বিষয়। তাই আমাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াও হতে হবে সন্তানের চেষ্টা ও সামর্থ্য নিয়ে। ফলাফল নিয়ে নয়। ধরা যাক, শিশু একটি পাজল মিলিয়ে দেখাল। বাবা-মা তার চেষ্টার প্রশংসা করে বলতে পারেন, 'তুমি পাজল মিলিয়েছ! চমৎকার! খুব সুন্দর চিন্তা। মনোযোগ দিয়ে কাজ করাটা আল্লাহর কাছে খুব পছন্দের।'

পাজল মিলল কি না, এটা বড় ব্যাপার না। সে যে এর জন্য চেষ্টা করেছে, এটাই বড় বিষয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। বাচ্চা যখন বিল্ডিং ব্লক দিয়ে টাওয়ার বানিয়ে

আগ্রহের সাথে বাবা-মা'র দিকে তাকায়, 'আব্বু দ্যাখো, আম্মু দ্যাখো', অধিকাংশ বাবা-মা'ই তখন বলেন, 'গুড বয়/গুড গার্ল! বেশ সুন্দর টাওয়ার তো!'

এভাবে বলার দ্বারা বাবা-মা মূলত **ফলাফলের** প্রশংসা করলেন। বাচ্চার **'চেষ্টা'** তথা টাওয়ার তৈরির **সামর্থ্যের** প্রশংসা কিন্তু হলো না।

ভালো কাজের প্রশংসা করা হলে শিশু 'ভালো কাজটি' করার উৎসাহ পায়। ঠিক তেমনিভাবে তার বানানো টাওয়ারের প্রশংসা করলে, সে বারবার ঠিক ওই রকম টাওয়ার তৈরিতে উৎসাহিত হবে। এতে করে বাচ্চাটির সৃজনশীলতা কমে যাবে। ভিন্ন উপায়েও যে টাওয়ার বানানো যায়, সেটা তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। এর বিপরীতে বাবা-মা যখন টাওয়ার তৈরির **'প্রচেষ্টা'** করার জন্য সন্তানের প্রশংসা করবেন, তখন বাচ্চাটির সামনে বিভিন্ন ধরনের টাওয়ার তৈরির পথ খুলে যাবে। বাবা-মা'রা 'গুড বয়/ গার্ল', 'সুন্দর টাওয়ার' এই কথাগুলোর পরিবর্তে নিচের কথাগুলো বলতে পারেন :

- ❖ **কাজের স্বীকৃতি দেওয়া :** 'তুমি টাওয়ার বানিয়েছ! মা শা আল্লাহ!'
- ❖ **বস্তুটির বর্ণনা দেওয়া :** 'বাহ, কত চমৎকার টাওয়ার! অনেকগুলো চূড়াও আছে দেখছি...!'
- ❖ **প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করা :** 'সুন্দর প্রচেষ্টা!'
- ❖ **এটিকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) সাথে জুড়ে দেওয়া :** 'যারা কঠোর প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।'

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাচ্চা যখন কোনো ছবি এঁকে বাবা-মা'কে দেখায়, তখন বাবা-মা বলে থাকেন, 'খুব সুন্দর দৃশ্য! গুড গার্ল!' এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো হয় এভাবে বললে, 'তুমি ছবি এঁকেছ দেখছি! অনেকগুলো লাল লাল ছোপ, সোজা সোজা দাগ এখানে দেখতে পাচ্ছি। খুব সুন্দর ডিজাইন করেছ তো। মা শা আল্লাহ!'

৪. মনোযোগ দিয়ে শোনা

খেলনা ভেঙে ফেলার কারণে আপনার বাচ্চা যদি তার কোনো সহোদরকে আঘাত করে, তখন আপনি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন—'আমি জানি খেলনা ভেঙে ফেলার জন্য আপুটার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে। ঠিক আছে, রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এজন্য ওকে পিট্টি দেওয়া তোমার মোটেও উচিত হয়নি। যখন

তোমার রাগ হবে, তখন আপুকে থামতে বলবে। আর সাথে সাথে তোমার খেলনাটিও ওর কাছ থেকে সরিয়ে নেবে, কেমন?'

সন্তানরা যেন নিজেদের আবেগ-অনুভূতি শনাক্ত করতে পারে এবং পজেটিভভাবে তা প্রকাশ করতে পারে, এ জন্য বাবা-মা'কে চেষ্টা করতে হবে। 'মনোযোগ দিয়ে শোনা'র ব্যাপারটা নিজেদের জীবনে অনুশীলন করতে হবে। এর দ্বারা সন্তানদের অনুভূতি জানতে হবে ও তাদের আবেগের স্বীকৃতি দিতে হবে।

এজন্য বাবা-মা কিছু কাজ করবেন :

- ❖ সন্তানের অনুভূতি কারণসহ উল্লেখ করবেন—'তোমার এমনটা লাগছে, কারণ হলো এটা।'
- ❖ সন্তানের ভুল আচরণটি উল্লেখ করবেন এবং কেন এটি ঠিক নয় সেটাও জানিয়ে দেবেন। বলবেন, 'তোমার কিন্তু ওটা করা মোটেই ঠিক উচিত হবে না, কারণ...।'
- ❖ এবার সঠিক আচরণটি বাতলে দেবেন—'যখন তোমার এমনটা লাগবে, তুমি এটা করতে পারো।'

বাচ্চারা বড় হতে হতে নিজেদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে শেখে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক উপায়েই হয়ে থাকে। যেমন চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, ভাঙচুর ইত্যাদি। বাবা-মা'র দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে বাচ্চার রাগ প্রকাশ করার শব্দ ও অনুভূতিগুলো খুঁজে বের করা। বাচ্চার সাথে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি না করে শান্তভাবে বিষয়টা বুঝিয়ে বলা। এভাবে বলা যেতে পারে, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার রাগ এই এই কারণে হচ্ছে। কিন্তু আমার সাথে চিৎকার করে কথা বলা তোমার ঠিক হচ্ছে না। কারণ এটি বড়দের জন্য অসম্মানের। যখন তুমি শান্ত হবে, তখন এ নিয়ে আমার সাথে কথা বলবে।'

সন্তানের সাথে এভাবে কথা বলার সময়, মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতে হবে এবং সন্তান যা বলছে, তার কাছেই সেটা পুনরাবৃত্তি করতে হবে। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করবেন না। বরং সে যা বলছে, ঠিক সে কথাটিই উপস্থাপন করবেন ভিন্নভাবে।

সন্তানের সাথে আলোচনায় আরও এক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তা হচ্ছে, একমুখী সংলাপ। সেটা আবার কেমন?

আমরা বাচ্চাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কেবল নিজেরাই বকবক করতে থাকি। ফলে একসময় বিরক্ত হয়ে বাচ্চারা আর বাবা-মা'র কথাই শুনতে চায় না।

পারস্পরিক আলোচনার সঠিক উপায় হলো সংলাপ বিনিময় করা। শুধু একমুখী বক্তব্য নয়। আর কার্যকর সংলাপের জন্য বাবা-মা'দের পরিমিত কথা বলা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস করা উচিত। যদি বাবা-মা আলোচনার সময় কেবল নিজেদের কথাই বলে যেতে থাকেন, তা হলে এটি হয়ে যায় একমুখী সংলাপ। এটিকে লেকচার কিংবা ঘ্যানঘ্যানানিই বলা চলে। অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আপনি কথা বলা বন্ধ করুন এবং সন্তানের কথা শুনুন। তার অনুভূতিটুকু মনের কানে শোনার চেষ্টা করুন।

আমাদের পূর্বসূরিরা এই শোনার গুরুত্ব বুঝতেন। ইমাম আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রহিমাহুল্লাহ) একবার বলেছিলেন, 'যুবক ছেলেরা অনেক সময় আমাকে এমন কিছু কথা শোনায়, যা হয়তো আমি তাদের জন্মেরও আগে শুনেছি। তবুও আমি তাদের কথা এমনভাবে শুনি, যেন তা আমি আগে কখনোই শুনিনি।'[১১]

শিশুদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, পরিবারে তাদের কথার গুরুত্ব আছে। যথাযথ মূল্যায়ন ও সমর্থন পেলে শিশুরাও বাবা-মা'র কথা শুনতে ও নির্দেশনা মানতে আগ্রহী হয়।

৫. সহমর্মিতা

সহমর্মিতা হচ্ছে অন্যের অনুভূতিটুকু অনুভব করার চেষ্টা। মুসলিমদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব, দানশীলতা, দয়া-মায়া ও ইসলামের মৌলিক চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

> রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তুমি দেখবে, বিশ্বাসীরা পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসায় একটি দেহের মতো; এর এক অংশ অসুস্থ হলে পুরো শরীরেই ব্যথা, নিদ্রাহীনতা ও জ্বর অনুভূত হয়।"[১২]

সহমর্মিতা ছাড়া অন্যের প্রতি দয়া, মায়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রকাশ করা কঠিন। সহমর্মিতার মতো শৃঙ্খলা শেখানোর এক ধরনের উপায় রয়েছে, যার নাম 'ইন্ডাক্টিভ ডিসিপ্লিন'। এতে করে শিশু তার নিজের ও অন্যদের আবেগ-অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে শেখে।

---

[১১] যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ৫/৮৬।

[১২] বুখারি, ৬০১১, মুসলিম, ২৫৮৬।

সন্তানকে সহমর্মিতা শেখাতে হলে তাকে অন্যের অনুভূতি মূল্যায়ন করা শেখাতে হবে। সহমর্মিতা শেখানোর জন্য বাবা-মা'রা যা করবেন :

- ❖ অন্যের দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরবেন : 'সে মন খারাপ করেছে', 'সে ভয় পাচ্ছে।'
- ❖ অন্যকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুটির ভূমিকা কী ছিল, তা আলোকপাত করবেন: 'তুমি তাকে ধাক্কা দিয়েছ, তাই সে ভয় পাচ্ছে।' 'সে মন খারাপ করে আছে, কারণ তুমি তাকে মেরেছ।'
- ❖ এরপর উপদেশ দিয়ে কিছু কথা বলবেন : 'অন্যকে সাহায্য করা খুব ভালো কাজ।' 'যারা অন্যের ওপর রহম করে, আল্লাহ তাদেরকে রহম করেন, ভালোবাসেন।'[১৩]

মনে করুন আপনি একটি ব্যাগ তুলতে গিয়ে আপনার বাচ্চার কাছে সাহায্য চাইলেন, কিন্তু সে তা কানেই তুলল না। তখন অল্প কয়েকটি কথার মাধ্যমে ব্যাপারটি সন্তানের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন— 'আমি খুব মন খারাপ করেছি, তোমাকে বলার পরও তুমি ব্যাগটা তুলতে আম্মুকে সাহায্য করলে না। অন্যকে সাহায্য করা একটা ভালো কাজ। আর মা-বাবাকে সাহায্য করলে আল্লাহও খুশি হন।'

মনে রাখবেন :

- ❖ স্পষ্ট ভাষায় সন্তানের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন : চলো, আমরা ভাগাভাগি করি।
- ❖ অন্যের প্রতি আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ বাচ্চারা বাবা-মা'র কাছ থেকে শেখে। বাবা-মা'কেই অনুকরণ করে।
- ❖ সন্তান যেন নিজেকে সহানুভূতিশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে শেখে, তার জন্য উৎসাহিত করুন।
- ❖ সন্তানের বয়সসুলভ মানসিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
- ❖ সন্তানের সাথে ইতিবাচক ভঙ্গিতে কথা বলুন, নেতিবাচক নয়।

৬. নীতিমালা প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকে। তেমনি ইসলামেও আমাদের জন্য রয়েছে কিছু নির্ধারিত নিয়মকানুন।

---

[১৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩৮১।

> রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের জন্য কিছু ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো নষ্ট কোরো না। তিনি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম কোরো না। তিনি কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, সেগুলো ভঙ্গ কোরো না। আর কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন—এটা ভুলক্রমে নয়, বরং তোমাদের সহজতার জন্যই; সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না।"[১৪]

তেমনি পরিবারেও আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা থাকা দরকার। পরিবারের সদস্যরা এগুলো অবশ্যই মেনে চলবে। এগুলো ছাড়া পরিবার হয়ে পড়বে পালহীন নৌকার মতো।

ক) নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করা

বাচ্চাদের সাথে নীতিকথা বলা, নিজে তাদের অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ও এই নীতিমালারই অন্তর্ভুক্ত। বাবা-মা কেন এত ছোট বয়সেই নিয়ম বানিয়ে দেবেন? কারণ, এটি হচ্ছে সন্তানদের জন্য আচরণের একটি কলাকৌশল, যা তারা বাকি জীবনেও অনুসরণ করবে। ধীরে ধীরে এটি তাদের মননে গেঁথে যাবে এবং কালক্রমে এগুলোই তাদের স্বভাবে পরিণত হবে।

এই পদ্ধতির প্রথম অংশ হচ্ছে, বাচ্চাকে নিয়মটি জানানো। যেমন, বাচ্চারা মেঝেতে কোনো বস্তু ফেলে দিয়ে বাবা-মা'কে তা বারবার তুলতে দেখে আনন্দিত হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাবা-মা'দের বলা উচিত, 'তুমি তোমার চামচটি মেঝেতে ফেলেছ? আমরা যখন কোনো কিছু ফেলি, তখন তা সাথে সাথে তুলে নিই।' বাচ্চাটি কিছু ফেলার পর বাবা-মা প্রতিবারই যখন এই ধরনের কথা বলবেন, তখন বাচ্চা একটি স্পষ্ট বার্তা পেয়ে যাবে। কোনো কিছু হাত থেকে পড়ে গেলে কী করতে হয়, তা বুঝতে শিখবে।

বাবা-মা'রা হয়তো অভিযোগ করতে পারেন—বাচ্চারা তো আমাদের কথা বোঝে না। হুম, কথা সত্য। তা সত্ত্বেও, এই উপায় অনুসরণ করার দুটি উপকারিতা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব বাবা-মা'রা বাচ্চাদের সাথে সব সময় কথা বলতে থাকেন, তাদের সন্তানেরা তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। তাদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। তারা ভাষাও সহজে আয়ত্ত্বে আনতে পারে। বাচ্চাদেরকে নিয়ম-নীতিগুলো জানানোর আরেকটি কারণ হচ্ছে, পরিণত বয়সে তাদের আত্মকথনের খোরাক

[১৪] হাকিম, ৭১১৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৭৬, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

জোগানো— যা তাদের আচরণ গঠনের ছাঁচ হিসেবে কাজ করবে।

এই কলাকৌশলের আরেকটি অংশ হচ্ছে, নিজেরা মডেল হওয়া। বাবা-মা'রা সন্তানকে একটি মূলনীতি শেখানোর পর নিজেরা তা করে দেখাবেন। ওপরের উদাহরণটিতে, বাবা-মা যখন বলছেন, 'আমরা যখন কোনো কিছু ফেলি, তখন তা সাথে সাথে তুলে নিই' তখন বাবা-মা পড়ে যাওয়া চামচটি তুলে দেখাবেন।'

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। খেতে বসলে বাচ্চা যদি চামচ দিয়ে শব্দ করতে শুরু করে, তখন বাবা-মা এভাবে বলতে পারেন, 'দ্যাখো, চামচ দিয়ে খাবার প্লেটে নিতে হয়।' সেইসাথে নিজেরা চামচ দিয়ে নিয়েও দেখাবেন।

ছোট বয়সে বাচ্চারা আসলে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তার চারপাশের জগৎটাকে চিনতে শেখে। তাই তাদেরকে সেটা করতে দেওয়া উচিত। এভাবে বলা উচিত নয়, 'শব্দ করা বন্ধ করো!' এভাবে 'না-বোধক কথা' বলার পরিবর্তে 'কী করণীয়' সেই কাজটি বলে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি তা (প্রাকটিক্যালি) করে দেখানো (যেতে পারে)। এটি ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

খ) নীতিমালা প্রয়োগ করা

যেসব বাবা-মা'রা শিশুকাল থেকে সন্তানের ভেতর মার্জিত আচরণের ভিত গড়ে দিতে পারেননি, তাদেরও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এখনও সময় আছে। আচরণ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি হচ্ছে—সন্তানকে যে নীতিটি মুখে মুখে বলবেন, বাস্তবে তা পালন করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। করতে বাধ্য করবেন। যেমন : রাতে খাবার খাওয়ার সময় যদি বাচ্চা এদিক-সেদিক হেঁটে বেড়ায় কিংবা খেলতে বসে, তবে বাবা-মা বলবেন—'খাবার সময় আমরা সবাই একসাথে বসব, ঠিকাছে?' এরপর বাবা-মা তাকে আদেশটি পালনের সুযোগ দেবেন। বলবেন, 'প্লিজ আব্বু, এসে বসো আমার পাশে।' তারপরেও যদি না শোনে, তা হলে বাবা-মা তাকে এনে খেতে বসিয়ে দেবেন।

কোনো বাচ্চা যদি একগাদা বইয়ের স্তূপ মেঝেতে ফেলে দেয় এবং তা না গুছিয়েই চলে যায়, তখন বাবা-মা বলবেন, 'আমরা যখন বই বের করি, তখন তা আবার গুছিয়ে রাখি।' বাচ্চাকে কাজটি করতে সুযোগ দেওয়ার পরও যদি তা না করে, তা হলে বাবা-মা নিজে বইগুলো একটি একটি করে তুলে বাচ্চাকে দেবেন। এরপর

বলবেন, 'প্লিজ সোনা, এগুলো শেলফে গুছিয়ে রাখো।' তাও যদি বাচ্চা না শুনে, তা হলে বইগুলো বাচ্চার হাতে তুলে দিয়ে তা শেলফে রাখার আদেশ দেবেন।

কাজটি কঠিন শোনালেও আসলে কার্যকরী। তবে অধিকাংশ বাবা-মা'রা যে ভুলটা করেন তা হচ্ছে, বাচ্চাকে কোনো একটা নিয়ম শেখানোর পর বাচ্চা তা পালন না করলে ওখানেই ক্ষান্ত দেন। এতে করে বাচ্চা বুঝে নেয় যে, বাবা-মা আসলে নিয়মকানুনের ব্যাপারে অতটা কঠোর না। এগুলো এড়িয়ে গেলেও চলবে। এ কারণে বাবা-মা'কে নীতিমালা প্রয়োগে দৃঢ় হতে হবে।

গ) নিয়ম স্মরণ করিয়ে দেওয়া

বাচ্চারা স্বভাবতই এসব নিয়ম কদিন পরপর ভুলে যায়। তখন সাথে সাথে তা মনে করিয়ে দিতে হবে। এভাবে বলতে পারেন, 'আচ্ছা, এটা হলে আমাদের যেন কী করার কথা?' কিংবা 'ওটা হলে আমরা তখন কী করি? চলো, তাই করি।' আমরা সাধারণত যেরকম বলে থাকি, 'আমি তোমাকে কতবার বলেছি ওটা করবে না!' অথবা 'আমি কী বলছি, শুনতে পাচ্ছ না? কেন তুমি ওটা করো?' অথবা 'আমি তোমাকে বলতে বলতে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি', এগুলোর চেয়ে আগের কথাগুলো বলা অনেক বেশি কার্যকর।

আমরা যা বলি, তাকে বলে ঘ্যানঘ্যান করা। আসলে বাবা-মা কোনো বিষয় নিয়ে যতই ঘ্যানঘ্যান করুক, আদতে তা কাজে আসে না।

৭. অনুশীলন

অনেকসময় বাবা-মা'রা মনে করেন, কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, শিশুরা তা ভালো করেই জানে। অথচ এটা ঠিক নয়। এই (ভুল ধারণার) কারণেই বাবা-মা'রা পরিবারে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার জন্য সন্তানকেই দোষারোপ করতে শুরু করেন। যেটি আদৌ তার দোষ নয়।

কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, বাচ্চারা তা জানতে না-ই পারে। অথচ তা না বুঝেই বাবা-মা'রা তাদেরকে এমন বিষয়ে বকাঝকা করেন, যা তার অজানা। পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ কেমন হবে, সন্তানদের সামনে তা (প্রাকটিক্যাল) করে দেখানো, এবং মৌখিকভাবেও সেটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রেই আসলে অনুশীলন ও 'রোল-প্লে' করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চিন্তা করে দেখুন, স্কুল-কলেজে কীভাবে বাচ্চাদের জরুরি শারীরিক কসরতগুলো শেখানো হয়। তাদেরকে শেখানো হয়, জরুরি অবস্থায় কীভাবে কী করা উচিত? আর সেটা তাদেরকে সারা বছর অনুশীলন করানো হয়। যেমন ধরুন, বাবা-মা'রা বাচ্চাদের নিয়ে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়ে যখন দেখেন যে, বাচ্চারা সেখানে হৈ-হুল্লোড়, দৌড়ঝাঁপ করছে, জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করছে, তখন অবাক হয়ে যান। সম্ভবত এই বাবা-মা সন্তানদেরকে শেখাননি, বেড়াতে গেলে কেমন আচরণ করতে হয়। বাচ্চারা এসব নিজেরাই বুঝবে বলে তারা ধরে নিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে বাবা-মা একপ্রকার 'রোল-প্লে' করতে পারেন। বাবা-মা হবেন মেহমান, আর ছেলেমেয়েরা মেজবান। এভাবে তারা সন্তানদের অভিনয় করে দেখাতে পারেন যে, মেহমানদের কেমন আচরণ করতে হয়। তারা বলবেন, 'কারও বাসায় বেড়াতে গিয়ে তাদের কোনো জিনিস ধরার আগে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। তারা যদি 'হ্যাঁ' বলে, তা হলেই আমরা তা দেখতে পারব। আর 'না' বললে আমরা তা ধরব না। আচ্ছা, তা হলে প্র্যাক্টিস করি চলো।' এরপর পর্যায়ক্রমে বাচ্চারা বিপরীত চরিত্রে অভিনয় করবে। যাতে করে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি অনুশীলন করানো যায় তাদের দিয়ে।

৮. আগে জানিয়ে রাখা

কোনো কাজ করার সময় বাচ্চারা এসে বিঘ্ন ঘটালে আমাদের বিরক্ত লাগে। বাচ্চারাও আমাদের মতোই মানুষ। তারা যখন মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করে বা খেলে, তখন যদি বাধা দেওয়া হয়, কিংবা বলা হয় যে কাজটা এক্ষুনি বন্ধ করো, তখন তাদেরও বিরক্ত লাগে। মন খারাপ হয়।

যেমন ধরুন, ছোটো মেয়েটা হয়তো বিল্ডিং ব্লক দিয়ে খেলছে, আর বাবা তখন কোনো কাজে বাইরে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে বাবার উচিত হবে বাচ্চাকে এ ব্যাপারে আগেই জানিয়ে রাখা। এটা বলা যে, 'আম্মু, রেডি হচ্ছি আমি। একটু পরই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। রেডি হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি খেলো। বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে জানাব। তখন কিন্তু খেলনা গুছিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক আছে মামনি?' সময় এগোনোর সাথে সাথে বাচ্চাকে আবার জানিয়ে দিন যে বেরোবার সময় হয়ে গেছে। বের হবার ১০ মিনিট আগে বলুন, 'আমরা এক্ষুণি বের হব। খেলনা গুছিয়ে ফেলো সোনা।'

এভাবে বাচ্চাদেরকে পরবর্তী কাজ অথবা পরবর্তী সময়ে করতে হবে এমন কাজের

কথা আগেই জানিয়ে রাখবেন। এতে তাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে। তারা জানতে পারবে, যে কাজটি এখন করছে, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। ফলে কাজটি হঠাৎ করে বন্ধ করতে বললে বাচ্চা অবাক হবে না।

দৈনন্দিন রুটিনের কাজগুলো যদি একটার পর একটা পর্যায়ক্রমে করতে হয়, তা হলেও বাবা-মা এভাবে বলতে পারেন। যেমন, বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার আগে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই মা বলবেন, 'আমরা প্রথমে ওয়াশরুমে যাব। টয়লেট সেরে হাত-মুখ ধুয়ে নিব। তারপর কাপড় পরব। তারপর সকালের নাস্তা করব, তার পর পাঠশালায় যাব ইন শা আল্লাহ।'

এর ফলে বাচ্চারা তাদের দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে আন্দাজ করতে শেখে। বারবার চিন্তিত হতে হয় না। 'এরপর কী হতে যাচ্ছে' এটা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে না তারা। যদি ঘটমান বিষয়গুলো সম্পর্কে বাচ্চারা অবগত থাকে, তা হলে বাবা-মা'র কথামতো চলা তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

৯. ইতিবাচক পরিণাম

'যখন এই কাজ করবে, তখন এই পুরস্কার পাবে'—একটি সঠিক আচরণকে উৎসাহিত করার জন্য এভাবে বলে কাজের পরিণাম বোঝাতে পারেন। যেমন, 'তুমি যখন তোমার ঘর পরিষ্কার করবে, তখন কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে।' এতে করে আপনার সন্তান বুঝতে পারবে যে, ভালো কাজের বিনিময়ে রয়েছে পুরস্কার।

বাচ্চারা যখন কোনো কিছুর জন্য আবদার করে, তখন যাতে ভালো আচরণের মাধ্যমে আবদার প্রকাশ করে, সেই ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি বেশ কাজে দেয়। বাবা-মা'রা সন্তানের কাছে যে আচরণ আশা করছেন, তা আগে সন্তানকে পালন করতে হবে। বিনিময়ে সন্তান যা চাইছে, তা পাবে।

কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

- বাচ্চা যখন রাতের খাবারের আগেই বিস্কিট খেতে চাইবে, তখন বলুন, 'যখন তুমি প্লেটের খাবার শেষ করবে, তখন তোমাকে বিস্কিট দেব, ইন শা আল্লাহ।'
- বাচ্চা যদি বাইরে খেলতে যেতে চায়, তখন বলতে পারেন, 'যখন তুমি অগোছালো খেলনা গুছিয়ে রাখবে, তখন বাইরে খেলতে যেতে পারবে।'

- বাবা যখন চাইছেন বাচ্চা ঘ্যানঘ্যান করা বন্ধ করুক, তখন বলবেন, 'যখন তুমি ঘ্যানঘ্যান করা থামাবে, তখন আমরা একটি নতুন গল্পের বই পড়ব, ইন শা আল্লাহ।'
- যখন বাবা-মা বাচ্চাকে দিয়ে 'প্লিজ' বলাতে চাইবেন, তখন বলবেন, 'যখন তুমি 'প্লিজ' বলবে, তখন তোমাকে জিনিসটি দেওয়া হবে।'

১০. বেছে নেওয়ার সুযোগ

কোনো কাজ করার সময় বাচ্চারা এর ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে 'বেছে নেওয়ার সুযোগ' দেওয়া হলে কাজটি তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ নিয়ে অমূলক দাবিও কম কম করে।

> আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দুটো বিষয় থেকে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে, তিনি সব সময় তুলনামূলক সহজটিই বেছে নিতেন। যতক্ষণ না তা পাপের কাজ হয়। আর পাপকাজ হলে তিনি এর ধারেকাছেও যেতেন না।'[১৫]

একাধিক বিষয় থেকে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে, মানুষের জন্য কাজ করা সহজ হয়। বাচ্চাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দুটো ইতিবাচক কাজের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন। যেমন : তোমার নিজের রুম গোছাও অথবা ঘর পরিষ্কার করো।

আর পছন্দ করার অপশন কতগুলো দেবেন বা কী ধরনের অপশন দেবেন, তা বাচ্চার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। যেমন : প্রি-প্রাইমারির বাচ্চাদের জন্য দুটি অপশনই যথেষ্ট। বড় বাচ্চাদের জন্য তিন-চারটি অপশন রাখা যেতে পারে।

যেমন : বাবা-মা যখন চাচ্ছেন সকালবেলা বাচ্চা সুন্দর একটি পোশাক পরুক, তখন বাচ্চাকে দুটি পোশাক থেকে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন। এতে করে বাচ্চা পোশাকের ক্ষেত্রে নিজের মতামত দেওয়ারও সুযোগ পেল, আবার আপনার পছন্দমতো দেওয়া (পোশাক থেকেই) বেছে নিল।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। নাশতার সময় বাচ্চা হয়তো বিস্কিট খেতে চাচ্ছে, আর বাবা-মা চাইছেন ফল খাওয়াতে, তখন 'না না, বিস্কিট খাওয়া যাবে না,

[১৫] বুখারি, ৩৫৬০; মুসলিম, ২৩২৭।

তোমাকে এখন কলা খেতে হবে', এমনটি বলবেন না। এভাবে বলতে পারেন, 'নাশতার সময় আমরা শুধু ফল খাব। তুমি কি কলা খাবে, না আপেল?'

আবার, বাবা-মা যখন বাচ্চার হৈ-হুল্লোড় থামিয়ে নিঃশব্দ কোনো খেলায় ব্যস্ত রাখতে চান, তখন 'লাফালাফি থামাও প্লিজ, বসে একটা বই পড়ো' এভাবে বলতে যাবেন না। বলবেন, 'চলো আমরা নতুন কিছু করি। তুমি কি বই পড়বে, নাকি আঁকিবুঁকি করবে?'

যদি তাদের পছন্দমতো কাজ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে বাবা-মা'র কাজে সাহায্য করতেও তারা কম বিরক্তবোধ করবে। 'তুমি কি টেবিল পরিষ্কার করবে, নাকি থালাবাসন ধোবে?'—এই কথাটির (চেয়েও ভালো কথা আছে)। যেমন : 'চলো, বাসনগুলো ধুয়ে ফেলি'—এটা (আগেরটার চেয়ে) বেশি ভালো শোনায়।

১১. সময়সীমা বেঁধে দেওয়া

> উসামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একবার আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বসেছিলাম। সা'দ, উবাই ইবনু কা'ব ও মুআজ (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-ও তাঁর সাথে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর এক মেয়ের কাছ থেকে বার্তাবাহক এসে জানাল যে, তাঁর নাতনি মৃত্যুশয্যায়। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলে দিলেন, মেয়েকে গিয়ে বোলো—"আল্লাহ যা নিয়ে নেন তা তাঁরই, আল্লাহ যা দেন তা-ও তাঁর। আর সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। সুতরাং সে যেন আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করে এবং ধৈর্য ধরে।"[১৬]

তাই বাচ্চাদেরকে কোনো কাজ দিলে বাবা-মা'র উচিত হবে কাজটির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। এতে করে কাজের গতি বাড়বে।

ক) এলার্ম সেট করা

ধরুন একটি দরকারি কাজকে আপনি আনন্দময় খেলায় রূপান্তরিত করতে চান। এজন্য বাবা-মা কাজটি শেষ করার একটি সময়সীমা বেঁধে দিতে পারেন। স্টপ ওয়াচে সময় সেট করে দিয়ে সন্তানকে বলবেন, 'চলো একটা খেলা খেলি। দেখি তো, এলার্ম বাজার আগেই তুমি কাজটি করে ফেলতে পারো কি না! তুমি কি প্রস্তুত?'

এক্ষেত্রে যে ঘড়িটি বাবা-মা ব্যবহার করবেন, তা যেন একটু জোরে জোরে

[১৬] বুখারি, ৫৬৫৫।

'টিকটিক' শব্দ করে। যাতে করে বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, সময় কাউন্ট করা হচ্ছে।

বাবা-মা'রা এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন সময় ব্যবহার করতে পারেন, যেমন : খেলনা গুছিয়ে রাখা, খেলা শেষ করা, ঘরের ছোট কোনো কাজ করা। তবে এটি দিনের মধ্যে এত বেশি ব্যবহার করা যাবে না যাতে বিরক্তি এসে যায়, আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

খ) কাউন্ট আপ/কাউন্ট ডাউন

এটিও অনেকটা এলার্ম বাজানোর মতো। তবে এক্ষেত্রে বাবা-মা নিজেই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত কাউন্ট আপ (কম থেকে বেশির দিকে গণনা) করবেন। অথবা বাচ্চা যদি কাউন্ট ডাউন (বেশি থেকে কমের দিকে গণনা) বিষয়টির সাথে পরিচিত থাকে, তা হলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে নিচের দিকে গোনা শুরু করবেন।

এই কাজটি তিনভাবে করা যেতে পারে :

- এলার্ম বাজানো খেলার মতো আরেকটি খেলা হিসেবে : 'আমি ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনব। দেখি এর মধ্যে তুমি সবগুলো ময়লা তুলে ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে পারো কি না।'
- 'যখন এটা করবে, তখন ওটা পাবে'—পুরস্কারের কৌশলটার মতো করে : 'আমি ১ থেকে ১০ গোনার মধ্যে যদি তুমি ময়লাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে পারো, তা হলে তোমাকে তোমার পছন্দের খাবারটি দেওয়া হবে।'
- সতর্কবার্তা হিসেবে : 'আমি ১ থেকে ১০ গুনছি, এর মাঝে তুমি যদি খেলনাটা গুছিয়ে না রাখো, আমি কিন্তু খেলনাটা নিয়ে নেব! ওটা দিয়ে তুমি আর খেলতে পারবে না।'

১২. চার্ট প্রণয়ন

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাআলা মানুষের সব ভালো কাজ ও মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।"[১৭]

আল্লাহ যেমন আমাদের কৃতকর্ম লিখে রাখেন, তেমনি বাবা-মা'রাও সন্তানদের কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করেন, তা একটি 'পুরস্কার-চার্টে' লিখে রাখতে পারেন। আর সে অনুযায়ী পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যায়।

---

[১৭] বুখারি, ৬৪৯১; মুসলিম, ১৩১।